শ্রেণী মনোভাব ও শ্রেণী চেতনা (Class attitude & Class consciousness) ঃ

‘শ্রেণী মনোভাব’ ও ‘শ্রেণী চেতনা’ বলতে কোন শ্রেণীর অর্ন্তগত সব মানুষের এমন বোধ বা চেতনাকে বোঝায় যার জন্য তারা সকলে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে নিজেদের অভিন্নরূপে এবং অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের থেকে ভিন্নরূপে মনে করে।। সামাজিক শ্রেণীর নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রেণীর বাইরের দিকটি অর্থাৎ মানুষের আচার-আচরণ দেখলেই হবে না শ্রেণীমনোভাব ও শ্রেণী চেতনাও জানতে হবে। ‘শ্রেণী মনোভাব’ ও ‘শ্রেণী চেতনা’ কথা দুটি প্রায়শই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হলেও তাদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ‘শ্রেণী মনোভাব’ বলতে বোঝায়, নিজ শ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে সমতা-মনোভাব এবং ভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের প্রতি ভিন্ন মনোভাব, আর ‘শ্রেণী চেতনা’ বলতে বোঝায় শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত মর্যাদাবোধ।

শ্রেণী মনোভাব (Class attitude) :

গিন্‌সবার্গ শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্যবোধের মূলে তিন প্রকার শ্রেণী মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। যথা ১) একই শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে সমতাবোধ, ২) উচ্চশ্রেণীর সদস্যদের কাছে হীনতাবোধ ও ৩) নিম্ন শ্রেণীর সদস্যদের কাছে অহমিকা বোধ। শ্রেণীগত এই মনোভাবের জন্যই প্রথমতঃ প্রত্যেক শ্রেণী সদস্য তার নিজ শ্রেণীর মান-মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে চায়, দ্বিতীয়তঃ জীবন যাত্রার মান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাতে নিম্নতর শ্রেণীর অর্ন্তগত না হয় সে ব্যাপারে ভীত ও শঙ্কিত থাকে, এবং তৃতীয়তঃ নিজেদের বিশেষ করে তাদের সন্তান-সন্ততিদের, যাতে উচ্চরর শ্রেণীতে উন্নীত করা যায় সে ব্যাপারে যত্নবান থাকে।

এপ্রকার শ্রেণীগত মনোভাব থেকেই অনেক সময় দেখা দেয় শ্রেণী বিদ্বেষ ও শ্রেণী সংঘাত। উচ্চতর শ্রেণীর সদস্যরা তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের জন্য নিম্নতর শ্রেণীর সদস্যদের শিক্ষাদীক্ষা, বৃত্তিগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পথে নানাভাবে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। গিন্সবার্গ বলেন, যে সব সমাজে শ্রেণী চলাচলকে অর্থাৎ নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হওয়াকে স্বাভাবিকরূপে গ্রহণ করা হয়, সে সব সমাজে শ্রেণী-বিদ্বেষ তেমন তীব্র হয় না; কিন্তু যে সব সমাজে শ্রেণী চলাচলকে স্বাভাবিকরূপে গ্রহণ করা হয় না অর্থাৎ যেখানে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া সম্ভব হলেও সহজসাধ্য নয়, সেক্ষেত্রে শ্রেণী-বিদ্বেষ তীব্ররুপে দেখা দেয় এবং উচ্চশ্রেণীর সদস্যরা নিম্ন শ্রেণীর সদস্যদের উন্নতির পথে নানারকম বাধার সৃষ্টি করে।

শ্রেণী-চেতনা (Class consciousness) :

'আমরা সকলে এক বিশেষ মর্যদাসম্পন্ন গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত' - এমন চেতনাই শ্রেণী-চেতনা। শ্রেণী-চেতনার উন্মেষ না হলে সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হতে পারে না। শ্রেণী সদস্যারা সমতা মনোভাব এবং শ্রেণীগত মূল্যবোধ থেকেই শ্রেণী-চেতনার উৎপত্তি হয়। শ্রেণী-চেতনার উৎপত্তি সম্পর্কে গিন্সবার্গ তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল -

প্রথমত ঃ শ্রেণীর অর্ন্তগত মানুষের মধ্যে সমরূপ আচরণ, সম-মনোভাব ও মূল্যবোধ থেকেই শ্রেণী-চেতনার উদ্ভব হয়। নিজ শ্রেণী সম্পর্কে মর্যদা বোধের উন্মেষ হলে প্রত্যেক শ্রেণীর অর্ন্তগত মানুষ নিজ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ঐক্যবোধ ও ভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবোধ অনুভব করে।

গিন্‌সবার্গ আরও বলেন, যে সমাজে শ্রেণী চলাচল সহজসাধ্য সেখানে শ্রেণীচেতনা অপেক্ষকৃতভাবে দুর্বল হয়। যে সমাজে শ্রেণী চলাচল সম্ভব নয় (যেমন ভারতীয় বর্ণভেদ বা জাতিভেদের ক্ষেত্রে), সেখানে শ্রেণী-চেতনা এক অভ্যাসগত মনোভাবে পরিণত হয়। এই দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের পারস্পরিক মনোভাব বিদ্বেষমূলক হয় না। কিন্তু যে সমাজে শ্রেণী চলাচল সম্ভব হলেও সহজসাধ্য নয়, সেক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনার অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়। এ প্রকার সমাজেই প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নিজ শ্রেণীর মান-মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস, নিম্নতর শ্রেণীতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা ও উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার বাসনা তীব্ররূপে দেখা দেয়।

শ্রেণী-চেতনার দ্বিতীয় শর্ত হল - প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ। ভিন্ন শ্রেণীর প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাবের জন্য কোন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ তাদের শ্রেণী-মর্যাদা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তার ফল স্বরূপ শ্রেণী-চেতনার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত ঃ একই রকম অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ থেকে শ্রেণীভুক্ত সকল মানুষের মধ্যে সমরূপ ঐতিহ্য গড়ে ওঠে এবং এই ঐতিহ্য শ্রেণী-চেতনাকে ক্রমশঃই দৃঢ়তর করে।

ম্যাকাইভার ও পেজ শ্রেণী-চেতনার তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

প্রথমতঃ শ্রেণী-চেতনার সম্প্রদায়গত অনুভূতি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। অস্প্রদায়গত অনুভূতির ক্ষেত্রে কোন উঁচু-নীচু জাতীয় মনোভাব থাকে না - 'আমরা সকলে একই সম্প্রদায়ভূক্ত' এমন এক সমতা মনোভাব থাকে। শ্রেণীর ক্ষেত্রে সামাজিক স্তর বিভাগ হওয়ায়, শ্রেণী-চেতনার মধ্যে উঁচু-নীচু জাতীয় মনোভাব থাকে। শ্রেণীগত মূল্যবোধ বা মর্যাদাবোধ থেকেই শ্রেণী-চেতনার উৎপত্তি হয়। এ প্রকার মর্যাদার তারতম্যের উন্মেষ না হলে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীকে ভিন্ন করা যায় না। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয় না।

এপ্রকার শ্রেণী-চেতনার বা শ্রেণীগত মর্যাদাবোধ যেমন একই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধের উদ্রেক করে, তেমনি আবার ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ভিন্নতাবোধ জাগ্রত করে। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, শ্রেণীগত মর্যদার ওপর ভিত্তি করে 'শ্রেণী-চেতনার উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের নিম্নশ্রেণীর মানুষ থেকে ভিন্ন করে তাদের (উচ্চশ্রেণীর মানুষদের) নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে'। সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবোধই প্রধান্য পায়, কিন্তু সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঐক্যবোধ এবং অনৈক্যবোধ উভয়ই প্রাধান্য পায়---এক শ্রেণীর সকল মানুষদের মধ্যে ঐক্যবোধ আবার ভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে ভিন্নতাবোধ। ম্যাকাইভার ও পেজ তাই বলেন, শ্রেণীগত-চেতনা যাদের বিশ্লিষ্ট করে, সম্প্রদায়গত চেতনা তাদের সংশ্লিষ্ট করে।

দ্বিতীয়ত ঃ **শ্রেণী-চেতনার সার্বত্রিক** - সব সমাজেই কোন-না-কোনভাবে প্রকাশ পায়। সাম্যবাদীরা যে শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেছেন তা এক আদর্শমাত্র, বাস্তবে যা কোথাও রূপায়িত হতে পারে নি। লেলিনের রাশিয়াতেও শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা সম্ভব হয় নি, কেননা সেখানে কম-বেশী মর্যাদা অনুসারে, মর্যাদা-ভিত্তিক বৃত্তি অনুসারে, দলীয় সভ্য অনুসারে, রাজনৈতিক অবস্থান অনুসারে সমাজের স্তরভেদকে অর্থাৎ শ্রেণীভেদকে অস্বীকার করা যায় নি। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে এই শ্রেণীভেদ এমন কি মর্যাদার বিভিন্ন মান অনুসারে জেলখানার কয়েদীদের মধ্যেও আছে, বন্দরের কর্মীদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে।

তৃতীয়তঃ যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণীগুলি থাকে, সেই সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণী-চেতনার প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। সমাজব্যবস্থাটি দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট হলে সেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্ন্তগত মানুষদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব দেখা দেয় অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর অর্ন্তগত মানুষ নিজ শ্রেণীর মধ্যে সুসংগঠিতভাবে থাকে এবং শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যবোধ - এক শ্রেণী থেকে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবোধ - অক্ষুন্ন রাখে। এরূপ, ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে যেমন ঐক্যবোধ থাকে, তেমনি ভিন্ন মানুষ সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবোধও থাকে। এ প্রকার ঐক্যবোধ শ্রেণী ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রত্যেক শ্রেণীর অর্ন্তগত মানুষ সুরক্ষিত করতে চায় বলে এরূপ ক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনার প্রকৃতি হয় রক্ষণাত্মক।

যখন কোন সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত লোকাচার, লোকনীতি ইত্যাদি অনুসারে অথবা কোন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা অনুসারে মানুষের জীবন নির্ধারিত হয় তখন শ্রেণী-চেতনার প্রকৃতি হয় রক্ষণশীল। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ, যথা - শিল্পায়ন বা নগরায়নের ফলে, যদি সমাজের লোকাচার, লোকনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে বা বিনষ্ট হয়, তাহলে শ্রেণী-চেতনার রক্ষণশীল ভাবটি আর থাকে না অর্থাৎ শ্রেণী-চেতনার পরিবর্তন ঘটে এবং সেই পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের কারণ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তে উদারপন্থী মনোভাব বা পরিবর্তনকামী মনোভাব দেখা দেয়। এ প্রকার অবস্থায় দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ শিল্পসংস্থায়, কলকারখানায় যুক্ত হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিত্তবান হয় এবং উচ্চতর শ্রেণীর চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা প্রণালী ইত্যাদি অনুকরণ করে।

এভাবে নিম্নশ্রেণীর বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং তাদের শ্রেণী-চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উচ্চশ্রেণীর অর্ন্তগত মানুষের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা সাধারণত এভাবে পরিবর্তিত হয় না, কেননা তারা তাদের শ্রেণীমর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে নির্দ্বিধায় শিল্প বা কলকারখানা ইত্যাদিতে যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর মানুষের মূল্যবোধ ও মর্যাদাবোধের জন্য তাদের শ্রেণী-চেতনার মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবই প্রাধান্য পায়। এজন্যই দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর মানুষ অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা অনেকবেশী দৃঢ় ও সুসংহত। । নিম্নশ্রেণীর মানুষ সাধারণত তার শ্রেণীমর্যাদাকে উন্নত করতে চায় বলে তাদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা পরিবর্তনশীল।

সামাজিক শ্রেণী ও জাতি - তুলনামূলক আলোচনা ঃ

সামাজিক শ্রেণী ও জাতি উভয় ক্ষেত্রে উঁচু-নীচুভাবে স্তরবিভাগ থাকলেও তাদের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ সামাজিক শ্রেণী সচল, কিন্তু জাতি সাধারণতঃ নিশ্চল। সমাজের নিম্নস্তরভুক্ত মানুষ যদি তার দক্ষতা ও যোগ্যতার জন্য অর্থ, বিত্ত ও মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে উচ্চস্তরভুক্ত মানুষের আচার-আচরণ ও জীবনধারাকে অনুসরণ করে, তাহলে ক্রমশঃই উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। তেমনি উচ্চস্তরের মানূষ যদি তার যোগ্যতার অভাবের জন্য উচ্চস্তরের মানুষের আচার-আচরণ ও জীবন ধারার প্রণালীকে অনুসরণ করতে না পারে তাহলে সে নিম্নস্তরে অবনত হয়। সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এপ্রকার উত্থান-পতন স্বাভাবিক হওয়ায় সামাজিক শ্রেণী-ব্যবস্থা সচল।

কিন্তু জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে জাতি-চলাচল, বিশেষ করে নিম্নতর জাতিতে উন্নীত হওয়া সাধারণভাবে সম্ভব হয় না বলে ঐ প্রথাকে 'নিশ্চল' বলাই সঙ্গত। হিলার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সামাজিক শ্রেণী হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে উঁচু-নীচু স্তর বিভাগ থাকে এবং যেখানে মানুষ নিম্নতম স্তর থেকে উচতর স্তরে উন্নীত হতে পারে।', ... এই উন্নীতকরণের পথ রুদ্ধ হলে সামাজিক শ্রেণীর পরিবর্তে তা হয় জাতিভেদ প্রথা।' শ্রেণীর ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সম্পদ সঞ্চয়ের দ্বারা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু জাতি বা বর্ণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণের (পুরুষ) মানুষ তার বৃত্তি পরিবর্তনের দ্বারা, অথবা অধিক উপার্জনের দ্বারা অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা অর্থাৎ কোনভাবেই উচ্চতর জাতি অথবা বর্ণের সদস্যরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কোন জাতের কৌলিক মর্যাদা কেবল ঐ জাতের জন্য নির্দিষ্ট। আপাতদৃষ্টিতে তাই ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাকে শ্রেণীর মত সচল মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু নিশ্চল।

দ্বিতীয়তঃ জাতির ক্ষেত্রে স্বজাতি বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, উঁচুজাতির সঙ্গে নীচু জাতির বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বিবাহাদি সম্পর্ক স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ব্রাহ্মণ সন্তান যদি শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করে তাহলে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তাকে জাতিচ্যুত হতে হয়। সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এমন কোন বিধান নেই। শ্রেণী-ব্যবস্থায় উচ্চস্তরভূক্ত মানুষের নিম্নস্তরভূক্ত মানুষের সঙ্গে বিবাহাদি নিষিদ্ধ নয়। এ প্রসঙ্গে ব্লান্ট বলেন, 'যদিও উচ্চস্তরভুক্ত কোন ইংরেজ পুরুষ সাধারণত তার সমস্তরভূক্ত পরিবারের মহিলাকে বিবাহ করতে চায়। তথাপি যে কোন পরিবারের মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা তার কাছে নিষিদ্ধ নয়।

যদি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইংরেজ পুরুষ কোন গৃহ পরিচারিকাকে বিবাহ করেন, তাহলে তাদের আত্মীয় পরিজন কিছুটা ক্ষুন্ন হতে পারেন। সেখানকার সংবাদপত্রে বিবাহটি এক মুখরোচক সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু এই মাত্র, তার বেশী আর কিছু হয় না। অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর মানুষের সাথে নিম্নশ্রেণীর মানুষের বিবাহাদি সম্পর্ক সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ভারতীয় জাতির ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় অনুশাসন এখন আর তেমন মান্য করা হয় না। অসবর্ণ বিবাহ অর্থাৎ এক জাতির পাত্রের সাথে ভিন্ন জাতির পাত্রীর বিবাহ এখন আর বিরল ঘটনে নয়। তবে, বর্তমানে অসবর্ণ বিবাহ সংবিধান সম্মত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্ত্রীয় বিধানকে অনুসরণ করে স্বজাতির মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

তৃতীয়তঃ জাতিভেদ প্রথার শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হলেও সামাজিক শ্রেণীরভেদের কেবল ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়। জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে - সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে। একইভাবে ভগবদগীতায় বলা হয়েছে, 'চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। অপরপক্ষে সামাজিক শ্রেণীভেদের কোন শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসকেই শ্রেণীভেদের কারণরূপে গণ্য করা হয়।

পাশ্চাত্যে রাজার ক্ষমতা ও অধিকারকে কখনো কখনো ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ও অধিকাররূপে গণ্য করা হলেও ঐ ধারণা যে যুক্তিহীন তা ধর্ম যাযকরাই বারবার ঘোষণা করেছেন। আসলে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যার সঙ্গে সমাজের নানা বিবর্তন ও পরিবর্তন যুক্ত আছে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে শ্রমবিভাগ, বৃত্তিবিভাগ, সম্পত্তির বন্টন ইতাদি প্রয়োজনীয়রূপে দেখা দেয় এবং শ্রম, বৃত্তি, সম্পত্তি ইত্যাদির পরিমাণ অনুসারে মানুষের কম-বেশী সামাজিক রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এভাবে সমাজের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলেই সামাজিক স্তর-বিভাগ বা শ্রেণীবিভাগের প্রচলন হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ